KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৩৩/২ [illegible], কল-৬ ([illegible]) এ-২৩, ([illegible]), কল-[illegible]
Collection : KLMLGK	Publisher [illegible] সান্যাল
Title	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 4/1-2 5/1 18/2	Year of Publication : Aug - Nov 1984 Aug 1985 (99) Dec - Feb 2000
	Condition : Brittle Good
Editor [illegible] সান্যাল	Remarks

C.D. Rol No : KLMLGK

অ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পঞ্চম বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা
আগষ্ট, ১৯৮৫

কবিতা
●
নাটক
●
প্রবন্ধ
●
গল্প

এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন :—

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাণিক রায়, সা' আতুল ইসলাম, অঞ্জনা বসু, অনিমেষ বসু' শিবদাস খাঁ, শতরূপা সান্যাল, নন্দন সেনগুপ্ত, চিত্রা চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ লাহিড়ী, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা ঃ শতরূপা সান্যাল

কন্যার জন্য একটি কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সারা বছর ফুল থাকে না,
গানের পাখি গান গায় না সারা বছর—

স্বপ্ন থাকে। চেনা মানুষ সারা বছর
কাছেই থাকে।

ফুল না থাকুক, মানুষ থাকে।

২৮ জানুয়ারী, ১৯৮৩

আমাদের প্রিয় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্প্রতি আমরা হারিয়েছি। আমাদের এই কাগজটির প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল। একটি পোস্ট কার্ডে ছোট্ট এক চিঠি এবং এই কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন তিনি অ-এর দপ্তরে। কবিতাটি পুনঃপ্রকাশিত হোল তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। স. অ.

কবিতা

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মানুষের কাছে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

মানুষ, তুমি অনন্তকাল
অনেক দিয়েছিলে,
ভোর ছিল তাই টকটকে লাল,
আকাশ ভাসত নীলে।
চিত্তে ছিল ক্ষমা তোমার,
চক্ষুতে সান্ত্বনা,
তাই ঝরেছে জ্যোৎস্নাধারার
মধ্যে অঢেল সোনা।

আজকে তুমি কৃপণ বড়,
দিচ্ছ না কিচ্ছুই।
তাই যেখানেই বাগান করো,
ফুটছে না বেল-জুঁই।
উঠছে না গান তাই বাতাসের,
আকাশ থমকে আছে।
হাত পেতেছি তাই আমি ফের
মানুষ, তোমার কাছে।

কান্নার ধ্বনি

বার্ণিক রায়

কেন যে এমন হলো বলতে পারি না,
আমি আর আমি নেই আমার ভেতরে ;
মানুষের স্বর কথা বলে না এখন ;
শুধু প্রতিধ্বনি, ছায়া, ভয়ে ভয়ে আতঙ্কের নাচ,
অমিতাভ বাদরের মুখ খেলা করে
চোখের সামনে, লম্পটের মতো হাসে।

নোংরা রাস্তা, পাশে মজা নদী, ঝরা পাতা ;
পশ্চিম সূর্যের লালে শুকনো ডালের গাছ আজ
প্রত্যাশার কান্না মেলে বক্ষ জুড়ে সন্ধ্যার বাতাস
নিতে চায় ; শিকড়ে জলের ঘন তৃষ্ণা,
বৃষ্টিহীন মেঘলা আকাশে ডিজেলের ধোঁয়া ওড়ে,
ঘাসের ভেতরে কান্না—

ঘাসের কান্নার ধ্বনি রঙিন স্বপ্নের নীলে ভাসে
রাত্রির আকাশে ॥

॥ ভালোবাসা অসুস্থ বহুদিন ॥

সা'আতুল ইসলাম

তোমার কেশর ছুঁয়ে শপথ দিলাম—
এই করাঘাত শেষ
তোমার হৃদয় দরজায়।

আকুল কান্না মুছতে গিয়ে
তোমার হাতের নৈবেদ্য
অবশেষে চোখ থেকে উঠে এসে
ছিটকিনি খুলে দেয়
আর এক দ্বারের।

এতদিন নির্দয় উদোম প্রান্তরে
বিমুখ হরিণী হয়েছিলে ;
আমার চোখের ব্যাধ
মৃগতৃষ্ণিকায় শ্রান্ত হলে
গাঢ় মমতায় গহন গাভীর মতো
হরিণী হে,
আমার বুকের মৃদঙ্গ স্পর্শ করেছিলে।

কোন অলৌকিক হাতের মুদ্রায়
সে মৃদঙ্গ ঘোড়া হয়ে গেছে,
লক্ষ লক্ষ রথাশ্বের অশান্ত ক্ষুরধ্বনি
এক নিবিড় সন্ধ্যায়
আকাশগঙ্গা পাড়ি দিয়েছিল।

তারপর অকস্মাৎ দ্বার রোধ করে
কি বোঝাতে চাও, একালের নারী,
কত ভাষা নিয়ে আমার বুকের ভাষা
বোবা হয়ে মরে,
গহন অসুখে ভোগে মন।

অতএব এই শেষ নিরুচ্চার সুধিত শপথ—
এই শেষ করাঘাত তোমার নিলয়ে, সুন্দরী—
জন্মদিনের শাড়ী কিংবা ঘড়ি
এদের অসুখ নয় শুধু
ভালোবাসা অসুস্থ বহুদিন
এসো শেষ মুনাজাৎ করি, যৌথ মুনাজাৎ !

নভযাত্রী

অঞ্জনা বসু

ধরিত্রীর সন্তান কোন্ দূর কক্ষপথে আজ
বুনে দেয় এই প্রজন্মের ভবিষ্যৎ

বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া শত সভ্যতার শূন্যে চাওয়া
মায়ের উষ্ণবুকে অমিয় পীযূষ
ক'ড়ে আঙুলের চাপে চাঁদের তিলক
হাজার রাকেশ আজ ভারতের ঘরে ঘরে
বেড়ে উঠছে আমাদের উচ্চাশায় স্নেহে।

পিতার অদেখা স্বপ্ন পিতামহদের স্বপ্নাতীত
আলোময় ব্রহ্মাণ্ডে আলোর সন্তান
আমাদের দুঃখ ও জ্ঞানের প্রতিনিধি
চন্দ্রপতি, ফিরে এস জয়মাল্য নিয়ে।
আমরা রয়েছি এই ক্ষীন আলো জীর্ণ বুভুক্ষায়
হিমালয় অন্তরালে প্রজ্ঞাপারমিতা সন্ন্যাসীর
বক্কলে, ও জ্ঞানহীন অন্ধ কুসংস্কারে
তবু তুমি আমাদেরই ছেলে
আকাশ ও পৃথিবীর ভালবাসা ভরা
"সারে জঁহাসে আচ্ছা" মাতৃভূমি এই।

স্বার্থপরতা

অনিমেষ বসু

তোমার নিজের জন্যে
কিছু কিছু দুঃখ তুলে রেখো
যক্ষের মতো, বড়ো সঙ্গোপনে ;
দেখো, হারিয়ে না যায় !

তোমার নিজের জন্যে
কিছু কিছু সুখ তুলে রেখো

কৃপণের মতো, বড়ো সঙ্গোপনে
দেখো, খরচ না হয় !

তোমার নিজের জন্যে
কিছু কিছু ক্রোধ তুলে রেখো
শোষিতের মতো, বড়ো সঙ্গোপনে
দেখো, শীতল না হয় !

তোমার নিজের জন্যে
কিছু কিছু নিজস্বতা বন্দী করে রেখো
তাপসের মতো, বড়ো সঙ্গোপনে
কারো, গোচরে না যায় !

তুমি এসো

শিবদাস খাঁ

প্রতিবারই
তোমার কপোলে এঁকে দিই রক্তাভ চুম্বন
প্রতিবারই
তোমাকে দিই ভালবাসার রক্তগোলাপ।
বলি, তুমি আমাদের
সুখ দাও
শান্তি দাও।
অথচ সব স্বপ্নই
দুঃস্বপ্ন হয়ে ওঠে।

কেন এমন হয় ?
সে কোন্ রুদ্রানী নগ্নিকা
সুখের বাসরে জ্বালায় আগুন ?
সে কেমন ক্ষুধিত শবের বাহক !
কেন এমন নীল নীল আকাশে
ছড়ায় মৃত্যুর গন্ধ ?

তবু—
প্রতিবারই শুনি তোমার
অলক্ত পায়ের শব্দ।
আমার বুকের ভেতর বোবা শব্দগুলি
গান হয়ে ওঠে,
তুমি এসো! তুমি এসো!!

গান

শতরূপা সান্যাল

ছুঁতে ছুঁতে পলকে ধানের মুঠো থই
লজ্জাবতী ডাল খানা নুয়ে গেল ভুঁয়ে
শুধুই তোমার গান শুনব বলে সকাল থেকেই
বসন্ত বউরির মতো জামের শাখায়
আলোয় ছায়ায় লুকোচুরি খেলা একলা একই।

যেমন নিবিড় করে জলেদের ঠুংরি শোনে গাঙচিল
পাটকিলে পালকে মেখে নেয় ভাটিয়াল
আমার শিরায় ধ্বনি প্রতিধ্বনি বাজে
পাহাড়ের সম্মুখে একাকী
ডাক আসে ঝিরঝিরে জঙ্গুলে ফিসফাসে
ময়না দ্বীপের হওয়া ওরা।
কবির সযত্নে গাঁথা স্বরলিপি চুরমার ক'রে
যে এসে দাঁড়াক বুকে—দানব বা মহাবিদ্যাজ্ঞানী
তোমার সুরের ফুঁয়ে উড়ে যাবে অভিকর্ষ ছিঁড়ে
আমি শুধু শুনব গান প্রতিটি কোষের নিমজ্জনে
কলমীর শাকের মত শাপ্‌লার ছায়ায়
সৃষ্টির ভৈরবী সুরে আনব ভোরবেলা।

ওপার-ওপার

—নন্দন সেনগুপ্ত

টিমটিমে আলোটাকে জোড়ালো করার চেষ্টায় হাতের টর্চটায় কয়েকবার চড়চাপড় মারে হেমাঙ্গ। নাঃ কোনও লাভ নেই। শালা ব্যাটারী ডাউন। কালকেই ডিপো থেকে ব্যাটারী নিয়ে আসতে হবে। এরকম টর্চ নিয়ে ডিউটিতে বেরোনো বেশ ঝুঁকির ব্যাপার। কোনও শালা ওপরওয়ালার নজরে পড়লেই রিপোর্ট করে দেবে। তখন আবার সাসপেনশন, শো-কজ্‌ সতেরো ঝামেলা। কম দায়িত্বের কাজ তো নয় সীমান্তরক্ষী বলে কথা। তার মতো তার টর্চকেও সদাজাগ্রত থাকতে হবে বৈকি।

বাইরে রাত ঝিমঝিম। পেঁচাদের টুকরো টুকরো ডাক কানে আসে। বর্ষার স্যাঁতসেঁতে রাত। হিমেল হাওয়া গাছের পাতা কাঁপায়।

টেমির আলোয় হেমাঙ্গর অভ্যস্ত হাত রাইফেলের নল পরিস্কার করতে থাকে। রোজই ওর রাতের ডিউটি। শালা, সারাটা রাত ঐ কাদা প্যাচপেচে জমিতে এধার ওধার ঘুরে মরতে হবে। "শালার চাকরির নিকুচি করেছে"। মনে মনে কথাটা বলেই হেমাঙ্গ জিব কাটে। ছিছি, একি বলে ফেলল সে। এই চাকরি না পেলে কোথায় থাকতো হেমাঙ্গ সাঁতরা আর তার পরিবারের সবাই?

নিজের পেশীপুষ্ট সবল দেহটার দিকে সস্নেহে তাকায় হেমাঙ্গ। এটার দৌলতেই তো চাকরি।

'সোনা আমার,' নিজের সরীরে একবার হাত বুলিয়ে আদর করে নেয় ও।

ঘরের কোণে ভাত ফুটছে।

আজকে চাল একটু বেশী করেই নিয়েছে। গোপাল যখন আসবে, তখন একেবারে খাইয়েই দেবে ওকে। গত পরশু গোপাল বাড়ী গেছে। আজকেই

ফেরার কথা। এসেই আবার রাত থেকে ডিউটি। ও ব্যাটাও তেমনি। সকাল, বেলা চলে আয় বাড়ী থেকে, তা না। যতক্ষণ পারা যায় বাড়িতে থাকা চাই তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ডিউটি করবে। তখন আর রান্নার সময় থাকে না। হেমাঙ্গ এরকম বারদুয়েক দেখেছে। তারপর থেকেই গোপালের বাড়ী থেকে ফেরার দিনগুলোয় ওর খাবারটাও হেমাঙ্গ তৈরী করে রাখে।

যদিও কাজটা বেআইনী, কারণ হেমাঙ্গ ভারতের সীমান্তপ্রহরী আর গোপাল বাংলাদেশের / কারো উপরওয়ালা যদি জানতে পারে, বাংলাদেশের সৈন্য, প্রায় রোজই, সীমান্ত ডিঙিয়ে ভারতে ঢুকে হেমাঙ্গর ঘরে আড্ডা মারে, তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে। কিন্তু কে আর জানাতে যাচ্ছে।

এই অঞ্চলে মানুষ বলতে তো দুজন। ভারত সীমান্তে হেমাঙ্গ আর শ' তিনেক গজ পুবে বাংলাদেশী পোস্টে গোপাল। দুজনেরই রাতের ডিউটি। দিনে ওদের ডিউটি নেই। ভারতের দিকে দিনের ডিউটির জন্য মাইলখানেক উত্তরে আর একটা ঘাঁটি আছে। সারা দিনটা একলা থাকার চেয়ে দুজনে মিলে সময় কাটানোই ওদের কাছে ভালো মনে হয়।

বাইনোকুলারটা একবার চোখে লাগায় হেমাঙ্গ। নাঃ গোপালের ঘর অন্ধকার। এখনও আসেনি ব্যাটা। হতভাগা, সাতটা বাজে, এরপর তুই আসবি কখন, খাবি কখন, ডিউটিই বা করবি কখন ?

অন্যান্য দিনগুলোয় এইসময় গোপাল থাকে। আজ একা থাকতে থাকতে নানা কথা মনে আসে হেমাঙ্গর। বছর দুয়েক আগে চাকরী নিয়ে এসেছিল এখানে। তার ছমাসের মধ্যেই গোপালের সঙ্গে আলাপ।

একদিন ঘরের সামনে, দুপুরবেলা হেমাঙ্গ বসে রেডিও শুনছিলো। হঠাৎ নজরে পড়লো, খানিক দূরে বর্ডারের চিহ্নিত সীমারেখার পরে জমিটা যেখানে ঝোপঝারের মধ্যে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে। চোখোচোখি হতেই সে হাত নেড়ে ডাকে হেমাঙ্গকে। হেমাঙ্গ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছিল, সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে চড়া গলায় বলেছিল,

—'কে তুমি ? এখানে কি চাই ?'

লোকটা একটু লাজুক লাজুক মুখ করে বলেছিল, —'লঙ্কা আছে কত্তা আপনার লগে ? দুইহান দিতি পারেন ?'

হেমাঙ্গ হেসে ফেলেছিল। লঙ্কাও এনে দিয়েছিল। গোপালের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ। তারপর দিনে দিনে সে আলাপ বেড়ে এখন ঘনিষ্ট বন্ধু।

একবার তো সে এক দারুণ মজার ব্যাপার। সন্ধ্যেবেলা গোপাল হেমাঙ্গর ঘরে বসে এটা ওটা গল্প করছে। এমন সময় দূরে গোপালের ঘরের সামনে একটা জীপ এসে দাঁড়ায়। গোপাল দেখেই আঁতকে ওঠে,

"কাম সারছে রে। অপ্‌সর আইছে।"

বলে হেমাঙ্গকে একরকম ধাক্কা দিয়েই নিজের ঘরের দিকে ছোটে। হেমাঙ্গ দারুণ উদ্বেগ নিয়ে বসে থাকে। কি জানি কি হয়। যদি অফিসার জেনে ফেলে যে গোপাল ভারতে ঢুকেছিলো, তাহলে কপালে দুঃখ আছে। রাতটা হেমাঙ্গর উদ্বেগেই কাটলো। পরের দিন গোপাল এসে একমুখ দাঁত বার করে বলল,—'হুমুন্দিরি কাল জবর বোকা বানাইছি। পোস্টে ফিরা দেখি, হালা আমায় খুঁজতি লাগ্যেছে। দেইখ্যাই তো এক্কেরে ফায়ার। কয়, পোস্ট ছাড়্যে কনে গিছিলে, কি করতি গিছিলে। তোমায় শো কজ করুম, হ্যান করুম, ত্যান করুম। আমি কলাম, হেইড্যা ছ্যার আপনি করতিই পারেন, তা আমার কথাটা তো শোনেন আগে। আমি এটু মাঠে গিছিলাম, ছ্যার, মানে এই জল ফিরিতি আর কি—'

এই অবধি বলা হতেই হেমাঙ্গ হেসে উঠেছিল আর গোপাল অফিসারকে বোকা বানানোর গর্বে একটা বিড়ি ধরিয়ে হেমাঙ্গর খাটের ওপর চেপে বসেছিল।

একবার হাতের ঘড়ির দিকে তাকায় হেমাঙ্গ। প্রায় আটটা বাজে। গোপাল করছেটা কি ? ভাবতে ভাবতেই গোপালের গলা পায় বাইরে,

'অ হেমা। কি করতিছিস ?'

হেমাঙ্গ উঠে বসে, গলা তুলে বলে,

'ওঃ বাবু এসে গেছেন। আসুন। গোলাম খাবার নিয়ে রেডি।'

গোপাল ঘরে ঢুকল,

—"দেরী কর্যে ফ্যালালাম"

—'তবে আর কি। আমায় উদ্ধার করলে। তুই একখানা মানুষ বটে। নে, হাতমুখ ধুয়ে আয়। ভাত দিচ্ছি খা। তারপর সারা রাত চরে বেড়াগে।'

গোপাল কাঁধের ঝোলাটা নামায়। হাত থেকে বন্দুকটা খাটের ওপর রাখে। সেদিকে হেমাঙ্গ বলে,

—'ও কিরে ? রাইফেল নিয়ে বাড়ী গেছিলি নাকি ?'

—'না না। তোর ঘরে আসতিছি, তাই নিই আলাম। তোরে দে পোজের করাবো।'

...'শালা আমায় তোমার বাপের চাকর পেয়েছ। ভাতও রাঁধবো। রাইফেলও পরিষ্কার করবো। তুই শালা কিছুই পারবিনা তো এ চাকরীতে এলি কেন?'

'সাধ কর্যে কি আর আলাম রে ভাই? আর কোন কাম পালি কি আর এই মিলিভারীর কাম করি? যাউক গিয়া'—

গোপালের একটা ছোট্ট শ্বাস পড়ে। রাইফেলটা হেমাঙ্গর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে,

—'নে নে কামটা সার। ফালতু কথায় রাত বাড়ে,'

হেমাঙ্গ রাইফেলটা নিয়ে ঘরের কোণে গিয়ে বসে। নলটা খুলে ভেতরটা দেখে। ঘরের বাইরে পা ধোয় গোপাল। জল পড়ার শব্দ হয়। গোপালের গলা শোনা যায়, হেমাঙ্গকে বলছে, 'কি পিছলা হইছে রে হেমা জাগাটা। পোস্কের কর। কোনদিন আছাড় খায়্যে পড়বি।' বলতে বলতে গোপাল ঘরে ঢোকে,

—"গামছাখানা আবার কনে রাখলি?"

—"খুঁজে নে,"

—'হ পাইছি।' গামছায় পা-হাত মুছে আরাম করে খাটের ওপর বসে একটা বিড়ি ধরায় গোপাল। হেমাঙ্গর রাইফেল পরিষ্কার করা দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে,

—'শালা অরায় আমাগো কুকুর বিড়েল মনে করে নাকি ক'দিনি?'

—'কেন কি হল?'

...'অপছরটারে কলাম, ছ্যার ছুটিটা কদিন বাড়ায়ে দেন। তা সুমুন্দি কয়, বডারে নাকি এহন লোক দরকার। হুঁ কাজির মর্দ্যি তো খাও আর শোও, তাও খাবারডা যদি ভদ্দরলোকের হতো। কাজ্। হুঁ।'

হেমাঙ্গ কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে শোনে, গোপালকে জিজ্ঞেস করে,

'বর্ডারে লোক কেন দরকার তা কিছু বলেছে?'

—'আরে দূদ্দুর। জানলি তো কবে। ও হারামজাদা কি জানে।

হেমাঙ্গ মাথা নেড়ে বলে,

—'নারে গোপাল। আমার কিন্তু ভালো লাগছে না। কটা দিন বরং এদিকে আসিস না। নিজের ঘরেই থাক।'

—'খুলি ক'তো কি কতি চাস।' গোপাল একটু নড়ে বসে।

—'না কিছুই হয়তো হবে না। কিন্তু অফিসার যখন এরকম বলেছে। হয়তো মন্ত্রীমান্ত্রী কেউ আসবে।

—"তা হতি পারে।"

হঠাৎ গোপাল একলাফে খাট থেকে নেমে পড়ে নিজের পোঁটলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা ঠোঙা টেনে বার করে। তারপর হেমাঙ্গর দিকে তাকিয়ে বলে,

—"ছাখ দিনি! কথা ক'তি ক'তি ভুলিই গিছিলাম। ক দেহি কি আনিছি।"

হেমাঙ্গ একটু ভেবে বলে,

—"কি জানি বাপু! বুঝতে পারছিনা।"

—"ডাল রে বোকা। সোনামুগির ডাল। মা দেছে তোর জন্যি"—

—"আমার জন্য?"

—"হ, তোর জন্যিই তো! কি সোয়াদ রে ভাই এ ডালের। কাল একবার খায়্যে ছাখ, আমারেও দিস। একা খাসনা য্যান।"

হেমাঙ্গ রাইফেল রেখে উঠে দাঁড়ায় কালিমাখা হাত ধুয়ে ডালের ঠোঙাটা নিয়ে খুলে ছাখে। খুশীতে মুখটা উপচে ওঠে। একমুখ হাসি নিয়ে গোপালের দিকে তাকিয়ে বলে,

—"এ তো অনেক রে। ওঃ মাসীমাকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাল দুপুরে আয়। জমিয়ে খিচুড়ি করবো।"

গোপালের মুখেও আকর্ণবিস্তৃত হাসি দেখা যায়,

—"হ কইছিস ঠিক। বিষ্টিকালে ঐডাই বালো।"

ডালের ঠোঙাটা হেমাঙ্গ যত্ন করে তুলে রাখে। তারপর আবার রাইফেল নিয়ে বসে। রাত শুনশান। শুধু রাইফেলের নলে শিক খোঁচানোর শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। হেমাঙ্গ একমনে নিজের কাজ করছে। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে গোপাল বলে,

—"বুনির বে ঠিক করলাম।"

—"বলিস কি?" হেমাঙ্গ চোখ তোলে, "এতবড় খবরটাই আগে দিস নি? তা ছেলে কি করে? মিলিটারী চাকরে না তো?"

—"ক্ষেপিছিস তুই? নিজি ঝুলিছি, আবার বুনটারে ঝুলাই? ছেলে ভালো। যশোর টাউনি কাপড়ির দুকান। চার ভাই, এই বড়। ননদের ঝামালি নাই। একেরে আমরা যা চাতিছি। বুনিরও ছাখলাম অমত নাই। তাই পাকা কথা কয়িই ফ্যালালাম।"

—"তা বেশ করেছিস! ছেলে দেখতে শুনতে কেমন?"

—"সেইডাই দেখি নাই রে ভাই। ঐ জন্যিই তো ছুটিডা বাড়াতি চালাম। চালিই কি আর হয়! যাক মায়ে তো দেইখ্যা পসন্দ করছে; ব্যাস। এইবারে চার হাত এক করি দিতি পারলিই বাঁচি।"

হেমাঙ্গ বলে,

—"হ্যাঁ মাসীমার যখন পছন্দ হয়েছে। তখন আর কথা কি? তা হচ্ছে কবে?"

—"দেহি। ছেলেপক্ষ তো দিন ঠিক কইরা পাঠাইবে কইছে।"

—"বা ভালোই।"

আবার দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ। হেমাঙ্গ কাজ শেষ করে ওঠে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর হাতে বাংলাদেশী রাইফেল সদ্য পরিষ্কৃত হাওয়ার গর্বে ঝকমক করতে থাকে।

গোপাল বলে,

—"অ হেমা। দে খাতি দে। কি রাঁধছিস্ কি?"

—"কি আর রাঁধব। ভাত আর তরকারী, ব্যাস্।"

আয় বসে যা। আর সময়ও নেই। ডিউটিতে বেরোতে হবে।

দুটো মানুষ খেতে বসে পাশাপাশি। খানিকবাদে খাওয়া শেষ হতে গোপাল উঠে যায়। হাতমুখ ধুয়ে চলে যায় নিজের পোস্টের দিকে। অন্ধকারে, সাবধানে পা ফেলে। সীমান্ত পার হওয়ার সময় টর্চ জ্বালা বিপজ্জনক।

হেমাঙ্গ উঠে ঘরের বাইরে যায়। বালতিতে জল কতটা আছে, অন্তত বাসনগুলো ধুয়ে রাখা যাবে কিনা, ত্যাখে। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আয়েস করে। ডিউটি আওয়ার্স শুরু হয়ে গেছে। এইবার বেরোতে হয়। হেমাঙ্গ ঠিক করে ফ্যালে, কিছুক্ষণ ঘরের সামনেই ডিউটি দেবে, অর্থাৎ সেই অবসরে বাসনগুলো ধুয়ে রাখবে। তারপর টহল মারতে বেরোবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অলসভাবে বিড়িটা শেষ করতে থাকে হেমাঙ্গ।

হঠাৎ অন্ধকারে একটা ধুপধাপ আওয়াজ শোনা যায়। হেমাঙ্গ চকিতে সতর্ক হয়ে ওঠে।

—"অ হেমা! হেমা! হেমা রে—"

একি গোপালের গলা না? এত রাতে গোপাল ফিরে আসছে কেন? কয়েক মুহূর্ত পরেই গোপালের আবছা অবয়ব নজরে পড়ে। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছে। হেমাঙ্গর ঘরের সামনে এসে গোপাল হাঁপাতে থাকে।

হেমাঙ্গ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে,—"কি হয়েছে?"

হাঁপাতে হাঁপাতেই গোপাল বলে,

—"রাইফেলখান ফ্যালায়ে গিছি নাকি রে তোর ঘরে, ছাখ দি'নি?"

—"সে কি? দাঁড়া দেখছি" হেমাঙ্গ ঘরে ঢোকে। পরক্ষণেই বেরিয়ে আসে, হাতে গোপালের রাইফেল। মৃদু ভৎর্সনার গলায় বলে,

—"তোকে নিয়ে আর পারি না। শালা, তুই রাইফেল ফেলে চলে গেলি কি বলে?"

—"পাইছিস? দে দে" গোপালের গলার স্বরে আশ্বস্ত হওয়ার আভাস।

—"একটু জিরিয়ে নে। দৌড়ে তো হাঁপিয়ে গেছিস।"

—"দৌড়াইছি কি সাধে? ওখান পাওয়া না গেলি কি যে করতাম। চাকরি তো যাতোই, জেল হলিও ক'বার কিছু ছিল না। এক্ষুনি হেড কোয়াটারেথে ওয়ারলেছ্ আয়েছে, তোদের দিকি, মানে ভারতের দিকি তাক কইর‍্যা দশ রাউণ্ড চালাতি হবে। তাই দৌড়ি আলাম। দে দে রাইফেলখান দে। যাই ভাই।" বলে গোপাল দৌড় লাগায় তার ঘরের দিকে।

হেমাঙ্গ হেঁকে বলে,

—"টোটা আছে তো? নাকি সেগুলোও হারিয়েছিস? লাগে তো আমার থেকে কটা নিয়ে যা।"

—"লাগবো না আছে টোটা।" অন্ধকার থেকে গোপালের বিলীয়মান স্বর ভেসে আসে।

হেমাঙ্গ তার রাইফেলটা নিয়ে খোলা জায়গাতেই বসে থাকে। গোপাল তো আর তার দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়বে না। আকাশের দিকে দশ রাউণ্ড দেগে দেবে।

একটু পরেই গোপালের পোস্ট থেকে আওয়াজ পাওয়া যায় রাইফেলের। হেমাঙ্গও আকাশের দিকে রাইফেল তুলে কয়েকবার ট্রিগার টিপে দেয়। গুলি বিনিময় সুসম্পন্ন হয়।

হেমাঙ্গ উঠে দাঁড়ায়। অন্যান্য পোস্টে বন্দুকের আওয়াজ পৌঁছে গেছে। এক্ষুনি সৈন্যবাহিনীর ব্যস্ততা শুরু হয়ে যাবে। তাকেও তৈরী থাকতে হবে অফিসারদের সামনে যথেষ্ট পরিমান ব্যস্তভাব দেখানোর জন্য।

হেমাঙ্গ, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রের পূর্বপ্রান্তের সীমান্তরক্ষী। দায়িত্ব কি কম!

দূরে কয়েকটা জীপের আলো দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই দু চারজন অফিসার এসে পড়েছে। হেমাঙ্গ উঠে দাঁড়ায় আড়মোড়া ভাঙে। তারপর হঠাৎই বিড়বিড় করে বলে ওঠে,

—"যতো শালা ফালতু খাটনি।'

শিশুর শিক্ষাও মনোবিকাশ

চিত্রা চট্টোপাধ্যায়

নার্শারী ও মন্তেশরী স্কুলগুলোর মাধ্যমে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে তাদের মেধার বিকাশ ঘটছে দ্রুততর। অনেকে আজো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গুলো সম্বন্ধে এক ধরনের নাক সিটকোনো ভাব ছাখান কিন্তু প্রকৃত শিশু শিক্ষায় বিকাশের জন্য এঁরাই হলেন শিক্ষা গুরু। রুশো, পেস্তালৎসী ও ফ্রয়েবেল, মন্তেশরী ও কেলারের ল্যাবোরেটরী পদ্ধতি এত ব্যাপক উন্নতি এনেছে যে শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধরণের পদ্ধতি অনবদ্য। গতানুগতিক শিক্ষায় বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লব আনেন রুশো। রুশোর ভাবাদর্শকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত কোরতে এগিয়ে আসেন পেস্তালৎসী। পেস্তালৎসীর চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেন উইলিয়াম ফ্রয়বেল। দক্ষিণ জার্মানীর উইস ব্রুক শহরে ১৭৮২ খৃ ফ্রয়েবেল জন্মান। ছোট বেলায় লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ হয়নি অর্থভাবে। ১৮০৫ খৃঃ তিনি ফ্রাঙ্কফুটে এক স্কুলে কাজ পান। সেখানে পেস্তালৎসীর শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেয়া হতো এর পর তিনি ইভারডুনে পেস্তালৎসীর কাছে এ সম্বন্ধে শিক্ষা নেন। এর পর তিনি এ শিক্ষায় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন এবং তিনি দেখেন যে এ শিক্ষাকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত কোরতে পারছেন না। ফ্রয়বেল সেসব দুর করে একটি সার্থক শিক্ষার পদ্ধতি রূপায়ন করেন। ১৮১৬ খৃঃ তিনি কীলহার্ড গ্রামে এক স্কুল করে তাঁর শিক্ষা চালু করেন তাঁর শিক্ষার পদ্ধতি ছিল শিশুর সুপ্ত শক্তির সামঞ্জস্যতারপূর্ণ বিকাশ। এখানে বাচ্চারা বাগানে কাজ কোরতো। এ কাজের অসামঞ্জস্যের মধ্যেই তাদের সম্ভাবনা প্রকাশ পেত। বাস্তব জগতকে চেনা ও সেই সঙ্গে কল্পনা শক্তির বিকাশ উদ্দীপ্ত করার জন্য নানা কাহিনীর ও কাজের অবতারণ করা হতো।

তিনি উপলব্ধি করেন শিশুকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলতে হলে তার শিক্ষা ৩ থেকে ৭ বছরের মধ্যে হবে। তাদের শিক্ষার জন্য কিণ্ডার গার্টেন নাম দিয়ে একটি স্কুল খোলেন। এই সার্থক নামা স্কুল থেকে যে শিশু শিক্ষার প্রবর্তন করেন তা আজ সারা বিশ্বের শিশু শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন যুগর এনেছে। বাগানের

ছোট চারা গাছগুলোর মতন ছোট বাচ্চারা স্নেহে যত্নে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠবে। আনন্দ মধুর পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠবে। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই তিনি ঐশী শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তির প্রকাশ তাই অন্যভাবে মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস কোরতেন সৃষ্টির মধ্যে কতকগুলি স্তর আছে এই স্তরগুলি একটির সাথে আর একটি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রেও ঐটি মহাসত্য।

ফ্রয়বেলের ছটি গিফ্‌ট বা প্রতীক এগুলি তিনি বিশ্বব্যাপী যে ঐশী শক্তির প্রকাশ / সেগুলিকে তিনি প্রতীকের মধ্য দিয়ে শিশুর সামনে তুলে ধরেছেন। প্রথম উপহার হচ্ছে নানা রঙের ছটি বল বা গোলক। গোলক হচ্ছে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের প্রতীক, তাই একে ঈশ্বরের প্রতীক বলে তিনি অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয়, কাঠের ফোলক, ঘনক (cube) সিলিণ্ডার প্রভৃতি নানা জিনিষ কাদা, বালি, কাঠের গুঁড়ো এদিয়ে নানা জিনিষ তৈরি। এতে সৃজনী শক্তির বিকাশ, আত্মবিশ্বাস, হস্ত সঞ্চালন, প্রভৃতি দক্ষতা বাড়ে।

এ ছাড়া শিশুদের মন ভোলানো ছড়াও ফ্রয়বেলের দান।

ফ্রয়বেল তাঁর শিক্ষায় লেখা ও পড়াকে স্থান দিয়েছেন শেষ স্তরে।

বর্তমান বিশ্বে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষার মূল্য অনেক।

যে মুহূর্তে শিশু চোখ খুলে প্রথম পৃথিবীর আলো দ্যাখে সে মুহূর্তেই পৃথিবীর রূপ, রস গন্ধ এর স্পর্শময় বহির্জগত এক বিরাট বিস্ময়কর বিভ্রান্তিময় রূপ নিয়ে তার চেতনার দরজায় এসে সজোরে আঘাত করে। আর সেই প্রাথমিক হতবুদ্ধিতা, এবং আনন্দের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষার শুরু হয়। প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডেকার্ট বিস্ময়, ভালোবাসা, ঘৃণা, কামনা, আনন্দ এসব মৌলিক প্রক্ষোভের কথায় বলেছেন শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি হলেই তার রাগ হয়। শিশুর এ সম্পর্কে, প্রাথমিক শিক্ষাকাল যেটাকে ডা মন্তেশরীর মতে স্পেশালাইজ্‌ড্‌ এরিয়া। সেটি হচ্ছে তার গর্ভকালীন অবস্থা থেকে ২ বছর তিন মাস। তার মধ্যেই তার শিক্ষায় শুরু হওয়ার প্রয়োজন। ডাঃ মন্তেশরী আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বেশী মূল্য দিয়েছেন যেমন water measurment, Broad wooden stair, Pink wooden Stair, Numbering Rod, counting Globules এর মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছেন। কাঠের Tower সাজনোর সময় তার আয়তন দৈর্ঘ্য ও পরিমাপ সম্বন্ধে সম্যকজ্ঞান লাভ করা, Broad stair সাজানোর সময় ছোট বড়র পরিমাপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান। এছাড়া গ্লাসে জল ঢালার পরিমাপ

ঐ দুবছর বয়স থেকেই শিশুর দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করে। এবং সে নিজে সব কাজ ক্লাসের মধ্যে নিজে করে। স্টিচিং সম্বন্ধে, বাটন হোল সম্পর্কে জ্ঞান হব নিজের বসার ম্যাট বা ছোট আসন ফোল্ডিং করে / যত্ন করে রাখার অভ্যাস আসতে আসতেই তার সমস্ত জিনিষ সম্পর্কে যত্নর ভাব আসে। এছাড়া শিশু তার নিজের কাজ নিজে কোরতেই ভালোবাসে তাই এসব ক্লাসে টিচাররাই হন তাদের দ্বিতীয় 'মা'। টিচাররা নিজেরা শুধু আদেশএর দ্বারা শিশুকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই ধরণের এ্যাপারেটস এর ভিত্তিতে শিক্ষা আরো জোরদার হয়। শিশুর ছোট দুটি পায়েই মানুষের যাত্রার জীয়ধ্বনী। সেই মনে করে বিভিন্ন ভাবে শিশুকে শিক্ষা দিলে দেখা যায় ছোট থেকেই ডিসিপ্লিনড্ ও ওয়েল বিহেভ্ড্ করে গড়ে তোলা যায়। বিদেশে ৭ মাস বয়স থেকেই সাঁতার শেখানো হয়। এর কারন সদিকে রোধ করা। এদেশে বাচ্চাদের স্কুল কখনও সুইমিং পুল ছাড়া হয়না। যদিও ভারতবর্ষে এ ধরণের খরচ করে স্কুল খুবই কম তৈরি করা যায় তবু শিশু শিক্ষার শুরে যদি সমস্ত রূপই ব্যবহার করা যায় তো সেটা হয় আদর্শ শিক্ষায়তন। ডা: মন্তেশরী বলেছেন ২ বছর তিন মাস বয়সই শিশুর শিক্ষা দেওয়ার বয়স। সে শিক্ষা বইএর মাধ্যমে নয় Activitics এর মাধ্যমে। উনি বলেছেন এ ধরণের এ্যাকটিভিটি দেখানোই শিশুকে শিক্ষা দেবার প্রকৃত উপায়। নিজের কাজ করা ও পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে গঠন, মনন ও শ্রবণের কাজ দ্রুতনীল করাই প্রকৃত শিক্ষার কাজ।

ডা: মন্তেশরীর নাম্বারিং রডস, ১ থেকে ১০ সংখ্যার রঙীন ছোট ছোট কাঠের রড মন ভোলানো রঙে রঙীন। সেগুলি দিয়ে শিশুর প্রাথমিক সংখ্যা সম্পর্কে ইমেজ গঠন করা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। শিশুকে জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান দেবার জন্যই এ ধরণের শিক্ষায় প্রবর্তন। সুষ্ঠভাবে জিনিস পত্র রাখা, জিনিসে যত্ন নেওয়া এসব ক্লাস মাধ্যমেই বাচ্চারা শেখে। এবং সর্বদা মনে রাখা দরকার ছোট্ট শিশুর প্রচণ্ড জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল এই বিরাট কর্মমুখর জগত সম্পর্কে। সে প্রতি পদেই প্রশ্ন রাখে এবং যতক্ষণ না তার সদুত্তর পায় তার জিজ্ঞাসায় শ্রান্তি নেই। বাড়ির পরিবেশও এখানে খুবই রুচিশীল হওয়া দরকার। আকাশের রঙ নীল একথা বললে বাচ্চারা ভোলেনা তাই কতটা নীল, কেমন নীল এসব তাকে এঁকে বুঝিয়ে দিতে হয়। গোলাপ ফুল লাল একথা বলা সহজ কিন্তু একথায় শিশু ভোলেনা। কি ধরণের লাল, লাল রং কেমন এসব তাকে বুঝিয়ে দিতে

হয়। নতুন ভাষা চয়ন ও শিশুর রূপময় জগতের সঙ্গে মিলিয়ে বোঝাবার ক্ষমতা থাকলেই তবে তাকে বোঝানো যাবে। নিজের বলে বোঝার ক্ষমতা, জানার ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। শিশুর ভাবনার রূপটি ফুটিয়ে তোলাই তার চেতনার উন্মেষ। মধুর ব্যক্তিত্ব ও স্নেহ ছাড়া বাচ্চাদের শিক্ষা দেবার অর্থ হয়না। দেড় বছর বয়স থেকেই বাচ্চারা যা কিছু দেখে, শোনে তাতেই অবাক হয় ও নকল কোরতে শেখে। শিশুদের প্রতি অনুরাগ ও স্নেহ তাদের মানসিক উৎকর্ষের পক্ষে প্রধান হাতিয়ার। গরম জল, ঠাণ্ডা জল এ ধরণের অনুভূতি জাগ্রত করে দেওয়া ও শিশুর নরম ত্বকে এর উপলব্ধি বোধ আনা, এই ধরণের প্রক্রিয়ায় শিশুর জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানোই শিক্ষার মূল কথা। স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ ও শব্দ এ সবেরই উপলব্ধি বা অনুভূতির সুর আনাই মন্তেশরীর একমাত্র লক্ষ্য।

ডা: মন্তেশরীর গার্ডেন সিস্টেম জীবন সম্পর্কে বাস্তব ধারণা যা শিশু মনে রেখাপাত করে। এটি একটি অনবদ্য শিক্ষার নীতি, তাঁর ম্যাট ফোল্ডিং, হ্যাংকি সেটিং ও অংক শেখার অভিনব চয়ন একটি সার্থক রূপান্তর। স্যাণ্ড পেপার দিয়ে শিশুর স্পর্শের অনুভূতি সৃষ্টিও এক আদর্শ শিক্ষা। হার্ড সফ্ট মেথড ও তাঁর রঙের বিন্যাস, তাঁর গ্রেণ মেজারমেণ্ট বা সাণ্ডর দানা পূর্ণ করে পরিমাপ কাজও বড় সুন্দর। যে কোনো শিশুই তাঁর মেথড-এর ক্লাসে আনন্দ পাবে, গ্রাইনিংসিষ্টেম ও তাঁর ব্লক গুলি সাজানোর মজা দেখে তারা অভিভূত হয়। মন্তেশরী পদ্ধতিতে a,e,i,o,u এই পাঁচটি বর্ণ নিয়ে লেখার ধারণা করা হয় ও Small letter দিয়ে পড়ানো শুরু হয়। এটা Constructive form জীবনের ক্ষেত্রে দেখা যায় Capital বা Big letters-এর থেকে small দিয়েই বেশী লেখার কাজ করা হয়। এ ধরণের স্কুল এখন প্রায়ই খোলা হচ্ছে ভারতে। এ্যাপারেটর্স লাগে ২ লাখ-৩ লাখ টাকার মত। ট্রেণ্ড টিচার লাগে ও লাগে ট্রেণ্ড আয়া। শিশুর একটি রূপকার জগৎ এই স্কুলগুলো। এখানে বাচ্চাদের শিক্ষা ও সহবৎ শেখানো হয় যাতে তারা একটি সার্থক মানুষ হয়ে ওঠে।

'অলীক কুনাট্য রঙ্গে' ঃ

ঃ বিলিতি মুরগীর দেশী ডাক ॥

বিবেকানন্দ লাহিড়ী

বাবু সমাজের আমোদ প্রমোদের উপকরণ রূপে জন্ম নেয় বাংলা নাটক। সাহেব Lebedeff লক্ষ্য করলেন যে, বাংলা নাটকাভিনয়ের আয়োজন করলে বিস্তর পয়সা আমদানী হতে পারে। গোলকচন্দ্র দাস নামে এক ব্যক্তি 'The disguise' নামক পুস্তকখানিকে বাংলা ছাঁচে ঢালেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তখনকার কোনো প্রচলিত বাংলা নাটক অভিনীত না হয়ে একটি চল্‌তি ইংরেজী নাটকের তর্জমা করে সেইখানি অভিনয় করা হয়।

এর পূর্বে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধ-বিজয়ের পূর্ব থেকেই বিজয়োল্লাস ও আমোদ প্রমোদের জন্য বিলিতি রঙ্গ মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করে। নবাবী আমলের শেষে কয়েকজন ইউরোপীয় যুবকের উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথম রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। লালবাজার ষ্ট্রীটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এখন যেখানে মিশন রো তার নাম ছিল 'রোপ ওয়াক' [Rope Walk]। এখানে একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। এই রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটারই কলকাতা বা বাংলার সকলের চেয়ে পুরাতন রঙ্গমঞ্চ। এর নাম ছিল প্লে হাউস (Play House)। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা আক্রান্ত হয়। এরই কয়েক বৎসর পূর্বে Play House প্রতিষ্ঠিত হয়।

তারপর চন্দননগরে বিলাতী নাটক অভিনয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। চন্দননগর গিরেটী তখন সমৃদ্ধশালী স্থান। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারী তারিখে ডচেরা স্বজাতীয় দল বল নিয়ে ফরাসী গভর্ণরের সঙ্গে দেখ করেন। ছ খানি গাড়ী করে দলের সকলে বেলা চারটার সময় চুঁচুড়া থেকে যাত্রা করে ছটার সময় তাঁরা নিজের স্থানে এসে পৌঁছান। এইখানে একটি ছোট রঙ্গমঞ্চ তৈরী ছিল। সাতটার সময় অভিনয় দেখাবার জন্য তাদের এইখানে নিয়ে আসা হয়। রাত্রি দশটায় অভিনয় শেষ হয়। কলিকাতার দ্বিতীয় রঙ্গমঞ্চ—The Calcutta Theatre, Lyon's Range এর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি খুব বড় জমি ছিল। তার ওপর এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এরপর বেঙ্গলী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতার নাম Herasim

Lebedeff। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের Calcutta Review পত্রিকায় স্যর জর্জ গ্রিয়ারসন এক প্রবন্ধে বলেছেন যে, কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটক অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি এ তথ্য আবিষ্কার করেছেন The Diary of Russian Adventurer থেকে।

কেউ কেউ বলেন যে, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীন বোসের বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয়ই বাংলার সর্বপ্রথম অভিনয়। নবীন বাবু এই অভিনয়ের জন্য বিস্তর অর্থব্যয় করেছিলেন, যতদূর জানতে পারা যায় তাতে প্রকাশ যে, অভিনয় খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।

এর পূর্বে হয় 'ছদ্মবেশ' নামে একখানি মিলনান্ত নাটক। Comedy disguise এর বঙ্গানুবাদ। গোলকচন্দ্র দাস কর্তৃক বইখানি তর্জমা হবার পর সেখানিকে অভিনয় করবার জন্য তদানিন্তন গভর্ণর জেনারেল স্যর জন শোর (লর্ড টেনমাউথ) নিকট অনুমতি চেয়ে পাঠান হয়, তারই অনুমতিক্রমে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর রাত্রি আটটার সময় অভিনয়ের দিন স্থির হয়। একদিন অভিনয় হবার পর অভিনয় বন্ধ থাকে। ২৫নং ডোমতলা লেনের রঙ্গমঞ্চেই প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হয়েছিল। পরবৎসর ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ মার্চ সোমবার ঐ নাটক খানির পুনরাভিনয় হয়েছিল। এরপর Lebedeff নিজের দেশে চলে যান।

এই অভিনয় স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকা স্ত্রীলোক দ্বারাই সম্পাদিত হয়েছিল। এর আগে কলকাতায় Mrs. Bristow দ্বারা পরিচালিত Chowringhee Theatre এ অভিনেত্রীর আবির্ভাব হয়েছিল।

Lebedeff এর থিয়েটারে দুশ্রেণীর আসন ছিল। বক্স ও পিটের দাম আট, গ্যালারী চার টাকা। অভিনয়ের দিন প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল। কয়েকজন দর্শক আসন থাকা সত্বেও ভেতরে প্রবেশ করতে চাইছিলেন। পরে আসন দুইশত করা হয়। প্রতি আসনের দাম একটি স্বর্ণমুদ্রা করা হয়। নির্ধারিত দিবসের পূর্বেই তা বিক্রয় হয়ে গিয়েছিল। Lebedeff এর Diaryতে পাওয়া যায় যে, এখানে Love is the best Doctor নামে আর একখানি নাটক অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু সমসাময়িক পুঁথিপত্রে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না।

Lebedeff তাঁর ডায়েরীতে লেখেন, 'আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা—সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হক না কেন—অনুকরণ ও হাসি তামাশা বেশী পছন্দ করে। সেইজন্য আমি

চৌকিদার চোর উকিল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুইখানি নাটকই নির্বাচন করিয়াছিলাম।' ঐকতানে হিন্দুস্থানী গদ, বাঙালীদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ও বিলাতী বাজনা হয়।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার পত্রিকা' বলেন—"পূর্বে ভারতবর্ষের রাজাদিগের সভায় নট নটী থাকত সঙ্গীত ইত্যাদির মাধ্যমে লোকরঞ্জন করা হত। আমাদেরও যাত্রা আছে কিন্তু তাও কদাচিৎ হয়। আমাদের শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের আনন্দবর্ধনের জন্য থিয়েটার আবশ্যক। কিন্তু এতেও বাঙালী দ্বারা বাংলা নাটকের অভিনয় প্রদর্শন আরম্ভ হল না। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীরা নিজেদের বাড়ী শেকসপীয়রের নাটক ও ভবভূতির ইংরাজী অনুবাদ অভিনয় করে বাঙালীদের মধ্যে নাট্যকলার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি হল ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর দ্বারা বিদেশী আদর্শে। পুরাতন যাত্রার সহিত এই বাংলা নাটকের কোন নাড়ীর যোগ নেই। যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই। বরং নাট্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর।" বরং প্রথম যে বঙ্গীয় নাট্যশালার পত্তন হয়েছিল তাও আবার বিদেশীর কীর্তি। বিদেশীর তৈরী নাট্যশালার থেকে বাঙালীর সত্যকার নাট্যশালার চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। এই চল্লিশ বৎসর যুগ পরিবর্তনের সময় উনবিংশ শতাব্দীর দিকে বাঙালী জীবনের উপর পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল। যাত্রা, পাঁচালী, কবি হাফ-আখড়াই প্রভৃতি দেশী ধরণের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। ইংরেজী কায়দার আমোদ প্রমোদ এল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। ইংরেজী কাব্য নাটকের সঙ্গে পরিচয় লাভের যাত্রা প্রভৃতি গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ তাঁদের নিকট রুচিকর হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে করতেন। তাঁদের অনেকেই কলকাতায় ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী অভিনয় দেখতেন।

প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'ই ইংরেজী-শিক্ষিত নব্য বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা। ১৮৩১এ এই নাট্যশালার দ্বার উন্মুক্ত হয়। প্রসন্ন কুমার হিন্দু থিয়েটারের অভিনয় সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশী উচ্চশ্রেণীর লোকেরা দেখতেন। বাংলাভাষায় অভিনীত না হওয়ার দরুণ সাধারণের বোধগম্য ছিল না। কিন্তু এরপর যে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলা-ভাষায় নাট্যাভিনয় হত। বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের অভিনয় এখানে সর্বপ্রথম হয়। এই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা শ্যামবাজারের বাবু নবীনচন্দ্র বসু। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো অবস্থিত, সেইখানেই ছিল নবীনচন্দ্র

বসুর বাড়ী। এইখানেই বৎসরে চার পাঁচটা করে বাংলা নাটক অভিনীত হত। এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরণে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হয়ে থাকে। এখানে বাঙালী রমণীদের দেখা যেত কারণ স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় হিন্দু রমণীরা করতেন।

এইভাবে Lebedeff কর্তৃক প্রথম, কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর দ্বারা প্রথম বাঙালী মঞ্চের এবং নবীনচন্দ্র বসু কর্তৃক বাঙালী নাট্যশালা ও বাঙালী নাট্যাভিনয় হয় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৩৩ ও ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও সার্থক বাংলা নাটক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দেই হয়।

বিদেশীর সখের থিয়েটার, দেশী সামন্ত প্রভুর বিলাস ব্যসনের উপকরণ ছিল যে থিয়েটার তা উঠতি শিক্ষিত স্বদেশী শ্রেণীর শিল্পচর্চার মাধ্যম হিসেবে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দিল। দেশী রাজা মহারাজাদের স্ফূর্তি ও আমোদ প্রমোদের সামগ্রী ছিল বলে শিল্প হিসেবে নাট্যকলার উন্নতি হচ্ছিল না। এবং বিদেশীরা সম্পূর্ণ এ দেশীয়দের কাছে বিচ্ছিন্ন সুতরাং তারা এদেশীয়দের জন্য এমন কিছু করার ক্ষমতা রাখেনা যার ফলে এদেশের নাটকের উপকার হতে পারে।

সুতরাং অপেক্ষা করতে হল আরও বহু বছর। কাজেই এই সময় সৌখীনদের 'উবু হয়ে ফুলের মূর্ছা' দেখে অথবা উঠতি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের 'বিলিতি মুরগীর দেশী ডাক' শুনেই তখন বাংলার ভোর হচ্ছিল। বাংলার যে অমিতব্যয়ী পুত্র 'অলীক কুনাট্য দেখে' ব্যথিত হয়েছিলেন আরও একযুগ পর তাঁর আবির্ভাব।

With Best Compliments :

UNIMEC ENGINEERS

Civil, Electrical & Mechanical Engineering
Consultants & Contractors

Head Office :
9, KRIPANATH LANE,
CALCUTTA-700005

Sales, Service & Works :
152, Acharya Prafulla Chandra Road,
CALCUTTA-700 006

DIAL—353929

চতুর্থ

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

শেষ বেলার রোগজীর্ণ, বুড়োটে, কুঁজো সূর্যটা ধুঁকতে ধুঁকতে বাঁশ ঝোপের নীচে ডুকরে-পড়ল। শিবের নাটমন্দির, বুড়ো কত্তার দালান কোঠা, খড়ের পালুইয়ের পাশে ন্যাতানো বেঢপ ছায়াগুলোর জ্যামিতিক্ পরিবর্তন হতে শুরু করেছে। অনাথের হাতে পাকানো পাটের দড়ি শক্ত হয়। দেহের চকচকে ঘামে চোখ বুলিয়ে নেয় একবার।

অনাথের মা শিবমন্দিরের পৈঠায় রোদ্দুরে পিঠ লাগিয়ে বিড়বিড় করে কি সব বলে যাচ্ছে তার কতকটা কানের ভেতর ঢোকে কতকটা ঢোকেনা। মানুষটার স্বভাব বদলাল না। কারো পিছনে না লাগলে একদণ্ড স্বস্তি পায় না। টিপটিপ করাটা তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গ্যাছে।

অনাথ একদৃষ্টে মাছরাঙা পাখিটার মাছ ধরার কৌশল দেখছিল। এবার উপরের নীল ছাউনির দিকে তাকায়। অপার বিস্তৃত, কোথায় এর শেষ কে জানে। পাটের দড়ি পাকানো এখনও শেষ হয়নি। সন্ধ্যে ঝুপ করে নেমে পড়বার তালে আছে।

দত্তবাড়ির বৌ সন্ধ্যে হতে না হতেই শাখে ফুঁ দিয়েছে। ওদের এই একটা চিরকেলে প্রথা। বিকেল থেকেই ঘরে খিল কপাট লাগিয়ে ওপরে ওঠা।

শিবমন্দিরের তকতকে উঠোনটা একেবারে নিরিবিলি। নরম ঘাসের ওপরে ফড়িং-এর লাফালাফি আর দুরন্ত চড়ুইয়ের কিচির মিচির।

মা বকছে। কি সব মাথামুণ্ডু বকবক করে। ক'দিন শান্তি ছিল যখন লাভপুরে হাসপাতালে চোখের ছানি অপারেশন করতে গেছিল। এবার দুটো চোখই খুইয়ে এসে জিভে শান দিতে বসেছে। একটু গলা উঁচু করে অনাথকে লক্ষ করে বল্লে, 'অ অনাথ, শুনিছিস কুণ্ডুদের বেধবা বৌ আমাদের ঐ পুবদিকের জায়গাটায় ভাগ বসাইতি আইছে'।

অনাথ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলল, 'অ, তাই।' যেন ওসব পরোয়া করে না। কে কুণ্ডুদের বৌ? স্বামীতো চিরকাল বহরমপুরে থেকে ঘুষের টাকায় ফুলে ফেঁপে এ্যাক্সিডেন্টে মল, এবার তার বিধবা বৌ জবর দখল করতে এসেছে

পরের জায়গা। এত হিম্মৎ দেখে নেবে। তার এই পেষাল শরীরে কম শক্তি নেই। বাবা ঠাকুরদা এককালে শ্রীপাটির জমিদার বাড়ির লেঠেল ছিল। রায় বেঁশে খেলা দেখিয়ে স্বয়ং জমিদার বাবুর কাছ থেকে দু'খানা শাল পেয়েছিল। এখনও ওগুলোকে যত্ন করে রেখেছে অনাথ। এগুলো দেখলেই গর্বে তার বুক ফুলে ফুলে ওঠে। ওসব ব্যবসা আর এখন নেই। এই আড়তে ঐ আড়তে ধান ওজন করে সম্বছরের পেটের খোরাক জোগাতে হয়। এর পর ছেলেপুলের অসুখ, নিত্য অভাব অনটন গায়ের বাড়তি মাংসের মত লেগেই আছে।

'তু কিছু করবি না? কুণ্ডুদের বৌকে বলবি ও আমাদের নেয্য জায়গা, দরকার হলে আমিন ডাকবি'।

—সে সব আমি ঠিক করে দোবো। দেখনা, কি মজাটা হয়।

পিছনে দড়ির কুণ্ডলী ঢাউস হয়েছে। দড়ি পাকানো শেষ করে আড়মোড়া ভেঙ্গে প্রকাণ্ড হাই তুলে বল্লে—'এই চনা, শোন।' চনা অনাথের ছেলে। বাপের ডাকে জড়সড় হয়ে সামনে দাঁড়াল। 'যা মরাইয়ের তলা থেকে একটা বড় হেঁসো নিয়ে আয়।'

বয়সে ছোট হলেও হেঁসো আনার তাৎপর্য চনার অজানা নয়। অন্ধকার রাত্তিরে এই হেঁসো সম্বল করে দু'মাইল পাড়ি দেয় অনাথ। প্রায় প্রতিদিনই। সন্ধে নামলেই অন্ধকারের গর্তে ঢুকে যায় সে। আসতে রাত গড়িয়ে যায়। পথেঘাটে শত্তুরের অভাব নেই। তাই ওই হেঁসোই ভরসা: চনা দাঁড়িয়ে থেকে বাপের মুখের ভাঁজের ব্যাখ্যা বুঝবার চেষ্টা করে। অনাথের ধমকানিতে টনক নড়ে তার। অনাথ গাগুলিয়ে একদলা নিঃশ্বাস ছড়িয়ে বল্লে, "যাবি তো তড়াতাড়ি, ওখানে কি করছিস।" এক ছুটে ঘর ঢুকে পড়ে চনা। হাঁপাতে হাঁপাতে নিয়ে হাজির হয়, চকচকে ধারাল হেঁসোতে চোখ সেঁধিয়ে দেয়। এদিয়ে সব কিছু কেটে ফালাফালা করে দিতে পারেসে। এমনকি তার সূক্ষ্ম চেতনাগুলোকেও। কতক্ষণ উদাস ভাবে বেলগাছের শালিক পাখি ছ্যাখে। তারপর কোঁচরে হেঁসো ঢুকিয়ে বলল, "যা ঘরে গেয়ে বলবি, ফিরতি রাত হবে।"

মা খ্যাঁক করে ওঠে। রোজ রোজ কুথা যাস তু। ঘরে কি মন টেকে না।

—সে জেনে তোমার কি?

—অ, তাই বটে। তা বলবি বৈ কি? অতি পেতাপ ভালো নয়।

—চুপ করে ঘর ঢোক। অত কথায় কাজ নেই। রেতেই ফিরব আমি।

মায়ের উত্তরের অপেক্ষা না করে চঞ্চল পায়ে হাঁটা শুরু করে। একেবারে

মাঠের কোলে। মাথাপাগলা হাওয়ায় দোলা ধানক্ষেত, বালু হাঁসের ধান খাওয়ার চকচক শব্দ পিছলে পিছলে কানের ভেতর ঢুকে যায়। জমাট অন্ধকার গাছের মাথায় মাথায়। দুখানা মাঠ পেরোলেই হাতিজলা, রানীর বাড়ি।

এখানে আসা তার কাছে নেশা হয়ে গ্যাছে। না এলেই সীমাহীন শূন্যতা খোঁচা লাগায়। অদ্ভুত মায়ায় রানীর ডাগর চোখ ডেকে বলে—এতক্ষণে রাত হল। আমি যে সেই থেকে বসে আছি। অভিমানের গলা। অনাথ বুঝতে পারে। 'তা আর কি করব বল। বাড়ির কাজ তো আছে'।

—এখানে আসেন ক্যানে?

—আঃ রে, তুমি যে আমার ইয়ে—মানে -গলা দিয়ে শব্দটা বেরোতে চায় না। আটকে থাকে। রানীর দুচোখের মায়া তার শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত রক্তের বেগ বাড়িয়ে তোলে।

ছোট্ট গুলঞ্চ গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ান অনাথ। ধারে কাছে জনবসতি নাই। শুধু বাঁশঝোপ, আশ্যাওড়ার ঝোপ, ব্যাঙের ডাক আর ঝিঁঝির একঘেয়ে ঝিনিঝিনি। এক ঝাঁক বাতাস বয়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে যায়। গন্ধটা খুব পরিচিত—চন্দ্রমল্লিকার।

কেরোসিনের কুপী জালিয়েছে রানী! আধমরা আলোয় তার পরিচ্ছন্ন মুখ অসম্ভব অজানা হয়ে উঠেছে তার কাছে। যতই তাকানো যায় সেই মুখ তাকে কোন এক রহস্যের অতলরান্ত গহ্বরে ডুবিয়ে দেয়।

"রানী।" অনাথ ডাকল। রানী এসে তার ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। হাত বাড়ালেই রানীকে ধরা যায় ছোঁয়া যায়—অথচ মনে হয় শতশত যোজনদূরে রানীর এক নূতনতর অস্তিত্ব—তাকে কোনদিন চেনা হয়নি তার। খিলখিল করে ফুল ফোটানো হাসি হাসে রানী। 'নাগরের রস দ্যাখো, ধর এক পাত্তর'।

—না—শরীর ভালো নাই আমার।

ঠিক ভালো হবে, লাও না। অত ঠাট ক্যানে। বৌয়ের ভয়ে? শেষেরটাতে অল্প গোঁচা। চুমুক না দিয়ে পারে না। ঢকঢক করে গিলে নেয় এক পাত্তর।

রানী তাকে নিবিড় বেষ্টনীতে আবদ্ধ করে রেখেছে। সেই যেদিন পৌষের জবজবে সন্ধ্যায় ধানের শিস কাঁখে তাকে দেখেছিল। সেই রানী, যে হাসির ঘোমটা টেনে বলেছিল, হা করে দেখছ ক্যানে, অত মেয়ের উপর নজর দেওয়া ভালো নয়'।

অনাথের কেমন খট্‌কা লেগেছিল। একটু বাঁকাচোরা কথার ধরন দেখে। আর সেই হিমেল রাতে তাকে নিয়ে গেছিল বাড়িতে। অনাথ এখনও পাঁচবছরের মধ্যেও জানে না মেয়েটার বাড়ি কোথা। স্বামী আছে কি না। জিজ্ঞেস করলেই ছুরি বেঁধা হেসে বলে, আমার কেউ নাই নাগর, আমি একা একা।

কি সম্মোহিনী শক্তি মেয়েটার। হাতে পায়ে শেকল জড়াতে পারে। রহস্যের ঘোর কাটে না অনাথের। রহস্যময়তার প্রতিমূর্তি হয়ে চলাফেরা করে রানী। ওর চব্বিশটা বসন্তের প্রতি কণা কণা ছলকে পড়া আঠা ছিটে লেগে থাকে অনাথের মনে।

মদের নেশার অবার্থ গুণ। ঢুলু ঢুলু চোখে রাণীর দিকে তাকাল অনাথ। তারও অবস্থা একই। চোখে, মুখে জড়ানো রয়েছে ফোঁটা ফোঁটা ক্লান্তি। 'আমাকে ধর না।' জড়ানো গলায় অসহায় আবেদন। অভ্যাসের বশে হাতের মুঠো ধরে ঝাঁকুনি দেয়। 'কি হল, কি হল রাণী, মুখ তোল—' চোখ দুটো আঠার মত বুঁজে আছে। সারা মুখে তীব্র যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

—কি হল, কথা বল রাণী···। রাণীর মুখে কথা সরে না। বহু কষ্টে ঢোক গিলে বলে—'মরণকালে মিছে কথা বলব না নাগর, এ সব্বোনাশ আমি নিজেই করেছি।'

অনাথের বুকে নেকড়ের আঁচড়। 'কি করেছ তুমি,'

—'তুমাকে মারতি গেছলাম। ঐ পাত্তরে কলকে ফুলের বীচ মেশানো আছে। ভুল করে আমিই খেয়েছি।' টস টস্ করে কষবেয়ে ফেনা ঝরে পড়ছে।

কুটিল চোখে মুমূর্ষু রাণীর দিকে তাকায়। এমনি করে তার প্রথম বৌ সাবিত্রী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। তার চোখ দুটো কি ভয়ংকর ড্যাবরা ড্যাবরা হয়ে ছিল।

অনাথের নেশা কোথায় ছুটে গ্যাছে।' ছেনাল মেয়েছেলে, সব্বোনাসী মেয়েছেলে, রাক্ষষী'। গাদা গাদা খিস্তি ছোঁড়ে রাণীর দিকে। তার অসাড় দেহটা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে নামিয়ে রাস্তায় পা বাড়ায়। অবশ মাঠ, বাঁশ ঝোপের ঝটপট, আমকাঁঠালের শীতল নিঃশ্বাস। থেকে থেকে শেয়াল প্রহর গোনায় ব্যস্ত।

আত্মা আছে কি? তাহলে নিশ্চয় কিছু নেবে সে। এই জনমনিষ্যিহীন মাঠে নির্ঘাৎ টুঁটি টিপে মারবে।

অন্ধকারের বুক টিপে টিপে ছন্দহীন পা ফেলে হাঁটতে থাকে সে। এত চেনাজানা পথেও ধাঁধা লাগে। সব রাস্তাগুলো এক হয়ে একই জায়গায় চলে

গ্যাছে। গাছে গাছে পাখপাখালির ডানা ঝাঁপটানোর শব্দ। কোথাও আবার রাতজাগা পাখির হাড় কাঁপানো চিৎকার। শেষরাতের বাতাস ঠাণ্ডা। কতক্ষণ আলপথে একা বসে আছে। পেত্নী সেজে রাণী পিছু নেয় নি তো। সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ভয় জেগে ওঠে।

চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে ভয়ের কামাল বুকে ছুরি বসিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞেস করল শরঝোপকে লক্ষ করে —কে ? রাণী পিছু নিলি।

ঝোপথেকে স্পষ্ট মানুষের গলার উত্তর—আমি রাণী, সাবিত্রী, চনার মা···

Phone : 6241

FRIENDS CONSTRUCTION

Fabricators, Electors, Mechanical & Civil contractors

Specialist in : PIPE LINE

CINEMA ROAD ● DURGAPUR-713201

With Compliments :

DAS GUPTA & CO. PRIVATE LTD.

54/3, COLLEGE STREET,
CALCUTTA-700073

BOOK SELLERS SINCE 1886

Telegram : BOIOLA, CALCUTTA

A. K. Paul & Brothers

MANUFACTURERS JEWELLERS
GOLD & SILVER ORNAMENTS

106, VIVEKANANDA ROAD,
CALCUTTA-6

আলোচনা—

"অ" পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সন্ধ্যা "মঞ্জীর" :

বেলগাছিয়ার সৃজনী কলাকেন্দ্রে গত ২২শে জুন এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সন্ধ্যায় আয়োজন হয়েছিল অ পত্রিকা'র উদ্যোগে। শিল্পীরা সকলেই নবীন। মোট পাঁচজন শিল্পী সেদিন শোনালেন খেয়াল, দাদরা ঠুংরি ও ভজন। প্রথম ভাগের অনুষ্ঠান শুরু হ'ল অমিতশঙ্কর দাশের বেহাগ রাগে খেয়াল দিয়ে। শিল্পীর গম্ভীর স্বর এবং ব্যাপ্ত বিস্তার শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল। শিল্পীর কণ্ঠে দাদরাটিও সুগীত। দ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন শতরূপা সান্যাল। এঁর গাওয়া কবীর, সুরদাস ও মীরার ভজনগুলি সুললিত ও সুগীত ছিল। তপন ঘোষের ঠুংরি অত্যন্ত মধুর এবং কোমল। শিল্পীর রেওয়াজ করা স্বরক্ষেপণ প্রশংসার্হ। বিশেষ করে "কওন গয়োরে মোরে শ্যাম"·····গানটি ভোলা যায় না। জানা গেল ইনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নিয়েই পড়াশুনো করেছেন।

দ্বিতীয় ভাগের অনুষ্ঠানে ছিল দুই শিল্পীর গান। রাগেশ্রী রাগ শোনালেন চন্দনা চক্রবর্তী। কী দাপটের সঙ্গে পরিবেশন করলেন তিনি তা সত্যই অবাক লাগে। শঙ্কর ভট্টাচার্য গাইলেন কয়েকটি ভজন। প্রত্যেকটিই অনুষ্ঠানের ভাবগম্ভীর মেজাজটিকে ধরে রেখেছিল। সেদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটির সাফল্য যেমন শিল্পীদের তেমনি আরেকজনেরও উপস্থিতির উপরও বর্তায়। তিনি শ্রীদীপক ভট্টাচার্য। এর চমৎকার উপস্থাপনা ও অনুষ্ঠান পরিচালনা সেই সন্ধ্যার গাম্ভীর্যের আবহমণ্ডল রচনা করেছিল। উদ্যোগীরা জানালেন—এরকমই বিভিন্ন সাঙ্গিতিক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দেবার প্রয়াস চালাচ্ছেন তাঁরা, যেখানে সংস্কৃতিসেবী নবীন-প্রবীন শিল্পী সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে একটি মঞ্চ। সৃজনী কলাকেন্দ্র অবশ্যই এর উদ্যোগের বড় অংশ। এই নতুন প্রেক্ষাগৃহটি সুন্দর, শব্দব্যবস্থাও এর প্রশংসনীয়।

—তাপস তলাপাত্র

বাস্তবতার নানান ভাষ্য

তরুণ সান্যাল

সাহিত্যে বাস্তবতার বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বাস্তবতা কাকেই-বা বলা হবে, এনিয়েও নানা মুনির নানা মত। তবে সমাজের অন্তর্গত মানুষ, তারা নানা সম্পর্কের টানা পোড়েনে ও জটিলতায় কেমন ভাবে বাঁচে-মরে, সমস্যা কেমনভাবে মোকাবেলা করে—সে সব কিছু শিল্পিত-ভাবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মানুষকে আবিষ্কার করাটাই বাস্তবতার দিক। জর্জি লুকাচ ১৯৩৪ সালে লিখেছিলেন "বিগতকালের মহান লেখক সেক্সপীয়র, সেরভেন্তেস, বালজাক, তলস্তই তাঁদের স্বকাল তাঁদের শিল্পকর্মে পূর্ণতায়, যথাযথভাবে ও প্রাণময়তায় প্রতিফলিত করেছিলেন . ...তাঁদের মূল সৃজনশীল পদ্ধতির রহস্য কি ছিল তা আমাদের আবিষ্কার করে দেখতে হবে। আর সেই রহস্যটি হল বিষয়গতদিক বা অবজেকটিভিটির, তাঁদের স্বকালের জীবন্ত ও গতিশীল প্রতিফলন, তা হল সেই অবজেকটিভিটির ও মূল দিকগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সাজুজ্য, বিষয়গত বাস্তবতার বিস্তৃত আন্তঃসম্পর্কগুলির ঘনীভূত প্রতিফলন অনুযায়ী আঙ্গিকের বস্তুসম্মত প্রকাশ।" [বাস্তবতার সমস্যা] এই বাস্তবতাকে তিনি বলেছিলেন গ্রেট রিয়ালিজম। আবার সমালোচনা মূলক বাস্তবতার লেখকদের কথাও তিনি বলেছেন। যেমন স্তাঁদাল। সমালোচনামূলক বাস্তবতা বা ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম-এ লেখকেরা দেখাতে চান ব্যক্তিমানুষের কেমন বিকৃতি ঘটে যায় বিষম সমাজের চাপে। এ বাস্তবতায় দেখানো হয়, মানুষের মহত্তর ও সুন্দর আবেগগুলি সমাজ কাঠামোর অনৈতিকতার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। দেখানো হয় মানুষের পূর্ণতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও সমাজগত বাধা বিপত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব, ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ও তার একাকিত্বের দ্বৈরথ, সমাধানহীন উভয় সংকটে কেমনভাবে নায়ক নায়িকারা পর্যুদস্ত, দেখানো হয় হাজারো বিরোধের জালে বাঁধা পড়ে আছে ব্যক্তিমানুষ। এক জাল থেকে মুক্ত হয়ে আরেক জালে বাঁধা পড়ে সে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনার মধ্যেই রয়েছে এই ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের ভূমিকা। যেমন শ্রেষ্ঠ ক্রিটিক্যাল রিয়ালিস্ট লেখক তালিকায় রয়েছেন টমাস মান। আমাদের পুতুল নাচের ইতিকথার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। অবশ্য গ্রেট রিয়ালিস্টই হোন বা ক্রিটিক্যাল রিয়ালিস্টই হোন, কেউ এমন এক ধরনের তত্ত্ব মাথায় রেখে লিখতে বসেন নি। পরের যুগের তাত্ত্বিকেরা ঐ সব

অভিধা তাঁদের উপর চাপিয়েছেন। তবে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে স্বীকৃত সাহিত্যতত্ত্ব। বলা হয়, লেনিনবাদী প্রতিফলনের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারী এই তত্ত্বটি।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর, ঐ দেশে নানা সাহিত্যসংস্থা গড়ে ওঠে। নানা বিপ্লবী সাহিত্য সংস্থার সদস্যরা সচেতনভাবে পুরোনো শোষণভিত্তিক সমাজের ভাবাদর্শগুলিকে ভেঙে বিপ্লবী আদর্শে সাহিত্যশিল্প রচনা করতে চাইছিলেন। কেউ কেউ বলছিলেন, অতীতের কোনো উত্তরাধিকার নেবার নেই সর্বহারা শ্রেণীর। প্রোলেটারিয়েটের আছে তার নিজের কালচার, প্রলেটকালট। লেনিন এসব অবশ্য মানতে চাননি। তিনি বলেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীর উত্তরাধিকার রয়েছে অতীতের সমস্ত সমাজস্তরের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও তার শিল্পকর্মের। ঐ গণতান্ত্রিক মানমুখিনতার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতা বোধ যুক্ত হলেই গড়ে ওঠে সর্বহারার বিপ্লবী সংস্কৃতি। ত্রৎস্কী অবশ্য বলেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর কেবলমাত্র আছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আর পেটি বুর্জোয়াদের আছে নান্দনিক সংস্কৃতি এদুটি মেলালেই নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গিকেই কাজে লাগিয়ে ১৯৩২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে, ছোটখাটো সংস্থাগুলিকে বাতিল করে দিয়ে নিখিল সোভিয়েত লেখক সমিতি গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়। ম্যাকসিম গোর্কি ছিলেন সোভিয়েত সৃজনমূলক সাহিত্যতত্ত্ব 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার' অন্যতম মূল স্রষ্টা। এই তত্ত্ব অনুযায়ী "বাস্তবতাকে তার বিপ্লবী বিকাশের গতিপথে, সত্যতায় ও ঐতিহাসিকতায় নির্দিষ্টভাবে শিল্পীকে তুলে ধরতে হবে।" ঐ বছর সোভিয়েত লেখক ফাদেয়েভ লিখেছিলেন "সৃজনশীল কর্মে সত্যকারের বাস্তবতা ঐতিহাসিক সত্যের ঘনিষ্ঠ করে দেখতে হবে, বাতিল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালানোটাই হবে তার সত্যিকারের বিকাশের প্রতিনিধিমূলক দিক।" তবে আঙ্গিকের বিষয়টি হবে খোলামেলা। "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কাছে কিছু কিছু সাহিত্য প্রকরণকে চরম বলে ভাবা, কোনো আঙ্গিক ও প্রবণতা, সৃজনশীল প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বেদবাক্য মনে করা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চরিত্রের বিরোধী।"

মুশকিল হল, পার্টি নেতৃত্ব কাকে বাস্তবতা মনে করে, তাকেই বাস্তবতা মনে করে লেখা, কেউ কেউ এক সময় সমাজতান্ত্রিক-বাস্তবতার মূল লক্ষ্য মনে করেছেন। তবে, সবসময়েই সব দেশেই কর্তাভজারা থাকেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়েই সত্যই অত্যন্ত সম্পদশালী বহুজাতিক সোভিয়েত সাহিত্য গড়ে তুলেছে। একদা-পশ্চাদপদ বহু অধিজাতির লেখকও এখন তাই বিশ্ববরেণ্য। বাস্তবতাতো আর একধৈয়িক সমীকরণ নয়। জীবনের জটিল রহস্য ও সম্পদ—যোগ্য সৃজনশীলতায় প্রতিফলিত করাটাই জরুরি। শিল্পবোধ, শৈলী, শিক্ষা ও সর্বোপরি মানুষের বিকাশ বিষয়ে মমত্ব ও মমতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাফল্য এনেছে।

"ইউ, এস, এস, আর—ভারত : তারকা অভিমুখে একটি পথ"

যৌথ মহাকাশ শিক্ষার একটি নতুন সোভিয়েত বই

মস্কো, (এ, পি, এন) : মস্কো প্রগ্রেস পাবলিশিং হাউস সোভিয়েত সাংবাদিক আই, লেখামকিন এবং ভি, জেনিসেনকোর রাশিয়ান ভাষায় লেখা একটি নতুন বই "ইউ, এস, এস, আর –ভারত : তারকা অভিমুখে একটিপথ"—এই নামে বার করেছে। বইটিতে সোভিয়েত এবং ভারতীয় জনগণের ভিতর বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতা, সোভিয়েত ও ভারতীয় মহাকাশ অভিযানের যৌথ প্রস্তুতি এবং এর সফলতা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

দুইবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর এবং সোভিয়েত নভশ্চর দলের নেতা ভি, শাটালোভ, যিনি বইটি সম্পাদন করেন, তাঁর মতে সোভিয়েত এবং ভারতীয় নভশ্চরেরা যখন যৌথ ভাবে ওড়ার শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন তখন থেকেই বইটি লেখার চিন্তা মাথায় আসে। 'আমরা জনগণকে বিশ বছরের পুরোনো সোভিয়েত—ভারতীয় যৌথ মহাকাশ আবিষ্কার সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং মহাকাশ যাত্রার প্রস্তুতির উন্নতির উৎসের সন্ধান দিতে চাই।" তিনি বলেন, যে সমস্ত ব্যক্তি এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের সাক্ষাৎকারও এই বইটিতে আছে।

ভি, শাটালোভ বলেন যে রাকেশ শর্মা এবং রবীশ মালহোত্রা—এরা দুজনেই খুব বিনয়ী এবং পরিশ্রমী এবং এরা দুজনেই বিস্ময়করভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রাশিয়ান ভাষা আয়ত্ত করেন। দুই বৈমানিক একই সঙ্গে শিক্ষা নেন এবং দু জনেই সমান সুযোগ পান। প্রধান এবং অতিরিক্ত বৈমানিকের মধ্যে সম্পর্ক সবসময়ই জটিল। কিন্তু ভারতীয় বৈমানিকদ্বয় এই পরীক্ষায় শুভেচ্ছা সহ ভালোভাবেই উৎরে যান।

সোভিয়েত এবং ভারতীয় বিজ্ঞানীগণ মহাকাশ আবিষ্কার বিষয়ে তাঁদের সহযোগিতার আদান-প্রদান এখনও অব্যাহত রেখেছেন। তাঁরা এখন চতুর্থ ভারতীয় ভূমি পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ পাঠাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভি, শাটালোভ বলেন যে মহাকাশ অভিযানের ব্যবহারিক দিকগুলি—যেমন যোগাযোগ এবং আবহাওয়া উপগ্রহ সম্পর্কে ভারত খুবই উৎসাহী। নতুন বইটির কপিগুলি ভারতীয় মহাকাশবিদদের কাছে পাঠানো হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে দিল্লীর 'বিকাশ পাবলিশারস' এটিকে প্রকাশ করবে।

সম্পাদকীয়

ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের ও হিরোসিমা-নাগাসাকি'র পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের চল্লিশ বছর—

চল্লিশ বছর আগে ৮-৯ই মে ১৯৪৫ ইউরোপের রণাঙ্গণে যুদ্ধ শেষ হলো। জার্মান নাৎসী বাহিনীর ঘটল চূড়ান্ত পরাজয়। ফ্যাসিস্টরা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল মিত্রশক্তির কাছে। অপর দিকে এশিয়ার রণাঙ্গণে তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি। জাপান পিছু হটছিল ; তার দুর্দ্ধর্ষ কোয়াংটুং বাহিনী লালফৌজের হাতে তখন পর্যুদস্ত। মাঞ্চুরিয়া মুক্ত হয়েছে, কোরিয়া উপদ্বীপে দ্রুত এগোচ্ছে সোভিয়েত বাহিনী। এমন সময় ৬ই আগষ্ট হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা পড়ল। অসামরিক জনগণের উপর এই ঘৃণ্য আক্রমণের কথা মানব সমাজের পক্ষে কোনদিনই ভোলা সম্ভব নয়। একদিনে প্রাণ হারিয়েছিল ৪৮ হাজার মানুষ হিরোশিমায় ও ৪০ হাজার মানুষ নাগাসাকিতে। পরবর্তী সময়ে ঐ দুটি শহরে আরও লক্ষ মানুষ নিহত হল। আজ চল্লিশ বছর পরেও সদ্যজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে পরমাণু বোমার তেজক্রিয়তার অভিশাপ দেহে নিয়ে। একদিকে জার্ম্মান ফ্যাসীবাদের দুঃসহ স্মৃতি অন্যদিকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা পৃথিবীর মানুষকে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ চিন্তাকে টান টান করে রাখে। মানুষের সংস্কৃতি সুকৃতির কোন মূল্যই নেই এই সব সমর প্রভুদের কাছে। তাই তারকা যুদ্ধের প্রস্তুতি, উন্নততর মারণাস্ত্র, পৃথিবী ধ্বংসকারী মহাশক্তিধর বোমার ভাণ্ডার নিষিদ্ধ হলো না আজও। এই খাতে ব্যয়িত অর্থের সামান্য এক অংশও পৃথিবী থেকে দূর করে দিতে পারত দুর্ভিক্ষ আর ক্ষুধাজনিত মৃত্যুভয় মহামারী, রোধ করতে পারত শিশুমৃত্যু। আমাদের এই সুন্দর সবুজ গ্রহে এখনও তো সব মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট আলো ও খাদ্য পায় না, দাঁড়াবার মত মাটিও নেই সবার। তবুও দখলকারী

সাম্রাজ্যবাদী হুংকারের কাপুরুষোচিত বাহাদুরির কাছে আজও প্রতিটি মানুষ সচেতন ও সোচ্চার নয়। যে বিড়াল সুযোগ পেলেই মাছ খেয়ে যায়, তাকে মাছের ভাঁড়ারের পাহারাদার করা আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বেড়ালতপস্বী মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের শান্তির ধুয়ো তুলে উন্মাদের মতন সমরসজ্জা সোচ্চার ঘৃণার বিষয়। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের চল্লিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশবছর আগের হিরোশিমা নাগাসাকির রক্তঝরা বিষণ্ণ দিনগুলি আজ স্মরণ করার সময় আমাদের আরো বেশী সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন এইটাই—এই সবুজ গ্রহকে ফুলে ফলে আরও সুন্দর করে তোলা হবে—না আরো চল্লিশ বছর পরে মহাশূন্যে আবর্তন করবে পৃথিবী নামক একটি গ্রহ যেখানে একদা মানব সভ্যতা ছিল। উত্তর একটাই—অস্ত্রসজ্জা নিষিদ্ধ হোক।

With Best Compliments :

Jhumpa Mondal

8, HARITAKE BAGAN LANE,
CALCUTTA-700 006

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম আকরগ্রন্থ

বিশ্বকোষ

নিজের দেশকে ভালো করে জানার ও বোঝার তাগাদায় এবং সাম্প্রতিক মানুষের সমসাময়িক বৃহৎ বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞানাহরণের স্পৃহা ও প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে পরিকল্পিত।

বোধোদয় গ্রন্থমালা

জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ১২৫টি গ্রন্থ লিখেছেন যশস্বী লেখকেরা। এ যাবৎ ৩৫টি প্রকাশিত। প্রতি গ্রন্থের মূল্য ৩ টাকা। ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে ২ টাকা মূল্যে পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি
৬০, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

A Quarterly R. N. 34415/82 August '85 One Rupee

ভুখা মানুষ ধর বই
ওটা হাতিয়ার

সাহিত্য-সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক পত্রিকা

'অ'

গড়ুন ও পড়ান।

১৯৮৫ সালের গ্রাহক চাঁদা (৬ টাকা)
নেওয়া শুরু হয়েছে।

শতরূপা সান্যাল কর্তৃক অ্যাঞ্জেল প্রিন্টার্স, ৪৩৭/বি রবীন্দ্র সরণী, (শোভাবাজার মোড়) কলিকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত এবং ৩১/২ ডঃ ধীরেন সেন সরণী (হরিতকী বাগান লেন), কলিকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত।